দৈনিক আমাদের সময়

27 JUL 2017

পৃষ্ঠা ৪

সৈয়দা আখতার জাহান

প্রচারমুখী অভিভাবক, প্রত্যাশার ফাঁসে সন্তান

'ইচ্ছে' নামে কলকাতার একটি বাংলা সিনেমা আছে। একটা পরিবারের গল্প। মায়ের প্রত্যাশার চাপ নিতে না পেরে ভেতরে ভেতরে বদলে যেতে থাকে ছেলে। কিন্তু মা বদলান না। কারণ তার একটাই চাওয়া, সন্তানকে পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সন্তানের ভালো থাকা যে তার হাতেই। বাবা-মা যে সন্তানের ভালো চান সে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তবে সেই ভালো চাওয়াটা সন্তানের ভালো করছে কিনা সেই বিতর্কের দোকান চলতেই পারে।

সন্তানের জন্ম মা-বাবার জীবনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর একটি। মায়ের গর্ভে আর বাবার মনে একটু একটু বেড়ে ওঠা সন্তানকে ঘিরে যে কোনো দম্পতি তাদের সেরাটা দিতে চান। কোনো কমতি রাখার প্রশ্নই ওঠে না সেখানে। শিশুর স্কুলে যাওয়া, ভালো ফলাফল করা বাবা-মায়ের খুশির উপলক্ষ হয়ে আসে। পিইসি, জেএসসি পেরিয়ে যখন একজন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় স্বাভাবিকভাবেই তার বয়স তখন ১৬-১৭ বছর। চঞ্চল-ঝলমলে কৈশোর তাদের প্রাণে। অথচ এই বয়সেই ঝরে যায় কিছু সম্ভাবনাময় জীবন। আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় তারা। প্রতিবছরই বোর্ড পরীক্ষাগুলোর ফলাফল প্রকাশের পর গণমাধ্যমের বরাতে বেশ কিছু আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যায়। কেন? এই কেনর উত্তর খোঁজার আগে এই বছরের কিছু খবর; প্রত্যাশা অনুযায়ী জিপিএ-৫ না পাওয়ায় ফলাফল প্রকাশের পর আতিকুর রহমান ইমন ট্রেনের নিচে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জিপিএ-৫ না পাওয়ায় ঘরের সিলিংফ্যানের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করেছে দীপ। অকৃতকার্য হওয়ায় জামালপুরের ইসলামপুরে ট্রেনের নিচে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে শারমিনা নামের এক শিক্ষার্থী। এ সময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন অন্তঃসত্ত্বা খালাও। বিষপানে আত্মহত্যা করেছে মো. শামিম ও জেসি আক্তার। ঘরের আড়ার সঙ্গে ফাঁস দিয়েছে তাহমিনা আক্তার।

প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া বা আশার অনুরূপ ফলাফল না করা খুব স্বাভাবিক ঘটনা; তার পরও সেই অপ্রাপ্তি আত্মহত্যায় রূপ নিচ্ছে কেন? যদিও আত্মহত্যা ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবুও একে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না। যে ছেলে বা মেয়েটার বয়স ১৬-১৭ বছর সে কেন আত্মহত্যার মতো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছে, সেটা নিয়ে আরও গভীর ভাবনার দরকার আছে বৈকি। মানুষ যেসব কারণে আত্মহত্যা করে তার মধ্যে পরিবার এবং অভিভাবকদের কথা অনেকের আলোচনায়ই তালিকার ওপরের দিকে উঠে এসেছে। অভিভাবক এবং সন্তানদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন অনেকটাই শিথিল। সন্তানরা অনুভব করতে পারছে না বাবা-মা তাদের ভালোবাসেন। জীবনের সব থেকে খারাপ সময়ে অভিভাবকদের পাশে না পেয়ে, অভিভাবকদের অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের কারণেই সন্তানরা এই ধরনের হটকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে।

রাষ্ট্রের এডুকেশন সেক্টরের সাফল্যের তালিকায় পাসের হার বাড়ে, বাড়ে তথাকথিত গোল্ডেন (এ+)-এর সংখ্যা আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে অভিভাবকদের প্রত্যাশা। এখন কজন ছেলেমেয়েকে শেখানো হয় যে, তাকে ভালো মানুষ হতে হবে? বরং সবাই জানে তাকে জিপিএ-৫ পেতে হবে। তাই যে কোনো মূল্যে সেই ফলাফলকে বগলদাবা করতে তারা মরিয়া! 'স্কুল-কোচিং-টিউশন' ছুটছে তো ছুটছে। কারণ 'সে জিতলে জিতে যায় মা।' মায়েরা এই জয়ের নেশায় সারাক্ষণ সন্তানদের ভালো থেকে আরও ভালোর দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। জ্ঞান তো আর পণ্য নয় যে, ভালো স্কুল কোচিং সেন্টার আর স্বনামধন্য শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে সেটা কিনে আনা যাবে। তবুও চেষ্টার কোনো কমতি রাখা যাবে না! প্রচারমুখী অভিভাবকরা আগে থেকেই জানেন কিংবা এমনভাবে বলে বেড়ান যে, তাদের ছেলেমেয়ে এ+ কিংবা গোল্ডেন এ+ পাবেই। যেন পরীক্ষায় অংশ নেওয়া একটা নামমাত্র অনুষ্ঠানিকতা!

অভিভাবকরা সন্তানদের আবদার পূরণ করেন আর বলে দেন, 'যখন যা চাচ্ছ দিচ্ছি, লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্ট করা চাই।' সন্তানরা পারবে কিনা, তার সামর্থ্য কতটুকু; তা বিবেচনা না করে নিজেদের প্রত্যাশা জানিয়ে দেন তারা। কিংবা তুলনা করেন অমুকের ছেলে, তমুকের মেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছে তোমাকেও করতে হবে। তোমার পেছনে তো কম খরচ করছি না। আচ্ছা, বেশি খরচ মানে কি বেশি ইনভেস্টমেন্ট, যে লাভের অঙ্কটাও বেশি হবে! সবাই সমান মেধাবী হন না কিংবা সবাই সমান পরিশ্রমীও নন। সে ক্ষেত্রে সবাই একই মানের ফলাফল করবে সেটা আশা করাটা অযৌক্তিক। বর্তমানে ভালো মানের স্কুল-কোচিং আর প্রাইভেট টিউটরে শিক্ষার্থীদের

পাঠানো হয় কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের প্রত্যাশায়। স্কুলগুলো কি কেবল পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিয়ে দায়িত্ব শেষ করছে? মানবিক কোনো শিক্ষা কি সেখানে গুরুত্ব পায়?

প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব আমাদের ভালো থাকতে দেয় না। কেননা প্রতিযোগিতার কোনো শেষ কিংবা সীমা নেই। তথাকথিত দায়িত্বশীল বাবা-মায়ের মনোভাবের কারণে ৫-৬ বছরের ছেলেমেয়েরাও জানে, ক্লাসে প্রথম হতেই হবে। পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়াকে তারা বলে লাড্ডুগুড্ডু! অভিভাবকদের লাগামহীন প্রত্যাশার চাপে প্রতিনিয়ত চিঁড়ে চ্যাপ্টা তারা। হবে না কেন বলুন; সন্তানের সাফল্য যখন সামাজিক স্বীকৃতির অলঙ্কার, তখন সে চাপ তো লাগামহীন হবেই! অথচ আয়োজন করে যাদের নিয়ে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে, তাদের অনেকেই কৈশোরটুকু পেরিয়েছে এই সেদিন। নিজের পরিবারের চোখে ব্যর্থ হওয়ার মতো লজ্জা আর কিছুতে নেই। আকাঙ্ক্ষা সাফল্য আনলেও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বয়ে নিয়ে এসেছে অস্থিরতা আর হতাশা। হতাশাই হচ্ছে আত্মহত্যার সব থেকে বড় কারণ। অনেক পরিবারেই সন্তান কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না করতে পারলে তাকে মানসিকভাবে কষ্ট দেওয়া হয়, কোনো কোনো পরিবারে গায়ে হাত পর্যন্ত তোলা হয়। যেটা সন্তানদের আত্মসম্মানবোধে আঘাত হানে। সে মেনে নিতে পারে না। কোথাও কোথাও অভিভাবকদের উদাসীনতা এবং পারিবারিক মানবিক শিক্ষার অভাব আত্মহত্যার কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। জেকবজিনারের মতে, আত্মহত্যা হচ্ছে হতাশা, বিষণ্নতা, ক্রোধ বা প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড; যা হটকারিতামূলক প্রতিক্রিয়ার ফল। অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েরা নিজেদের অত্যন্ত উপেক্ষিত, অবহেলিত, প্রত্যাখ্যাত ও ব্যথিত বলে মনে করে। আত্মহত্যা, ক্ষেত্রবিশেষ আকস্মিক বিপত্তিমূলক সামাজিক পরিবর্তনের ফল হিসেবেও ঘটে থাকে।

সামাজিক চাপ সামলাতে অসমর্থ হলে কিংবা প্রচলিত অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হলেও ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যেসব কারণ আত্মহত্যায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে তার মধ্যে আবেগ প্রবণতা, অন্যের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা, নিজের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব, সামাজিক চাপ, আবেগশূন্যতা, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মানসিকতা, আত্মমর্যাদাহানি, সামাজিকভাবে ভাবমূর্তি বিনষ্ট, ভাগ্যকে দোষারোপ, বিষণ্নতা, অনিয়ন্ত্রিত রাগ, নিকটজনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট, হঠাৎ কোনো ক্ষতি, সাম্প্রতিক ন্যক্কারজনক ঘটনা, প্রতিকূল পরিবেশ প্রভৃতি মানুষের আত্মহত্যার প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

গণমাধ্যম এখন সব ঘরে, সমাজের সব শ্রেণিতে নিজের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ় করে নিয়েছে। যা দেখে, শোনে তা থেকেই শেখে। গণমাধ্যমের প্রচারণা মানুষের জীবনে গভীর রেখাপাত ফেলে। পরীক্ষায় ব্যর্থতার কারণ তুলে ধরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেসব তথ্য দেওয়া হয় তার মধ্যে থাকে, কে আত্মহত্যা করেছেন, কোথায় করেছেন, কখন করেছেন, কিভাবে করেছেন, মানে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে করেছেন তার সবিস্তার বর্ণনা। ক্ষেত্রবিশেষে 'সুইসাইড নোট'ও ছেপে দেওয়া হয়। তুলে ধরা হয় অভিভাবক ও প্রিয়জনদের আহাজারি, সন্তান হারানোর শোক, পরিচিতদের সমবেদনা। 'যেটা' তুলে ধরা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শই থাকে উহ্য। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ যদি পৌঁছে দেওয়া যায়, যাতে আর কোনো ছেলেমেয়ে যেন এই ভুল পথে পা না বাড়ায়। মানুষ দ্য কমনওয়েলথ হেলথ অ্যান্ড এজেন্সিসের এক গবেষণায় দেখা গেছে গণমাধ্যমে প্রকাশিত আত্মহত্যার সংবাদ বা আত্মহত্যা চেষ্টার সংবাদে দীর্ঘদিনব্যাপী আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে হতাশা বা বিষণ্নতার কারণ মিলে গেলে, সংবেদনশীল মানুষদের মনে সেই সংবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের সংবাদ সম্ভবত কিছু মানুষকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে আগ্রহী করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন বলছে, বর্তমানে এ দেশের ১৫-২৯ বছর বয়সের মানুষের মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ 'আত্মহত্যা'। হতাশা এবং হটকারিতাকেই এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পরীক্ষার ফলাফলকে ছেলেমেয়ের জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি এবং একমাত্র পরিচয় হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী সংস্কৃতি ভাবিয়ে তোলার মতো। মানুষ বয়সকে ধারণ করে আর সময়কে যাপন করে। অনেকেই আছেন যারা বর্তমান প্রজন্মকে অমনোযোগী বলে নির্দ্বিধায় দোষারোপ করেন, তারা কী ভেবে দেখেছেন 'এই প্রজন্মকে কতটা অস্থির সময় পার করতে হচ্ছে?' মানসিক বয়ঃসন্ধিকালীন এসে তারা দেখছে পাশে আস্থা রাখার মতো মানুষ নেই। প্রযুক্তির হাতছানিতে কেবলই পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা। ভীষণ অপ্রিয় সব বিষয় চারপাশে আলোচিত। অপরাধ, অপ্রাপ্তি আর অপবাদ এই তিন নিয়েই তাদের সকাল-দুপুর-রাত। লাগামহীন প্রত্যাশার ভারে নুয়ে পড়েছে; অথচ তারা তাদের কৈশোরটুকুও পেরোচ্ছে মাত্র!

স্বপ্ন আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এক করে ফেলবেন না। অভিভাবকদের অনেকেই জানেন না যে, সফলতা আর সার্থকতা এক জিনিস নয়। যারা প্রত্যাশার অতলে তলিয়ে গেছেন, তারা জানেন অতল বড় অন্ধকার। ব্যর্থতার মধ্যে লজ্জা নেই, লজ্জা তো চেষ্টা না করে হার শিকার করার মধ্যে। ছেলেমেয়েকে উৎসাহ দিতে শুরু করুন। তাদের বুঝুন, বোঝান এবং ভালোবাসুন। সন্তানরা যদি এই বোধ নিয়ে বড় হয় যে, বাবা-মায়েরা তাদের প্রতি কেবল দায়িত্ব পালন করছেন কিংবা তাদের কর্তব্যবোধের জায়গা থেকেই দেখছেন; সেটা কোনো আশার আলো দেখায় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একজন মানুষকে সার্টিফিকেট বা সনদ দিতে পারে, ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষাটা পারিবারিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকেই দিতে হবে। সন্তান ভুল করলে শুধরে না দিয়ে নিপীড়নমূলক শাস্তি দেওয়াটা যে কতটা অযৌক্তিক ও অমানবিক, সেটা নিজেরাই বিবেচনা করুন। প্রলোভনকে জয় করতে হবে। ছেলেমেয়ে দিয়ে তুলনা করার মানসিকতা থেকে নিজেদের দূরে রাখুন। সামাজিক সুনাম, আত্মীয়দের কাছে প্রশংসনীয় হয়ে ওঠার জন্য ছেলেমেয়ের ওপর প্রত্যাশা চাপিয়ে দেবেন না। সন্তানদের মেনে নিতে শেখান, মানিয়ে নিতে শেখান। জীবনের অনেকগুলো জানালা। সবগুলো খুলে সন্তানকে উদার হতে শেখান। জীবনটা বিশাল, এক বছরের পাস-ফেল, পরীক্ষার রেজাল্ট সেখানে একটা ঘটনা মাত্র, পুরো জীবন কখনই নয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের লেখা ছড়া শুনিয়ে সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন 'একবার না পারিলে দেখো শতবার।' সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েকে শেখাতে হবে, সব থেকে সুন্দর এই জীবন! সবার শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

❑ সৈয়দা আখতার জাহান : সহকারী অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

ডিপার্টমেন্ট অব বাংলাদেশ ...
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........
তারিখ.........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর